চিরকুট ৩৫

একই বলে বোধ হয় শাপে বর হওয়া। একসিডেন্টের পর গাড়ীটা ইন্স্যুরেন্স থেকে রাইট-অফ করার পর কেনার জন্যে আরেকটা গাড়ী খুঁজছি । এ দিকে গিন্নী সামারের চমৎকার আবহাওয়ার সুযোগে একটু সময় নিয়ে যাচাই করে গাড়ী কেনার পক্ষে। হোম মিনিষ্ট্রীর নির্দেশের বাইরে কথা না বলার মতো যথেষ্ট বয়স আর অভিজ্ঞতার ফলে কোন উচ্চবাচ্য না করেই পাবলিক ট্রানপোর্ট ব্যবহার করাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো। সুতরাং শুরু হলো সেই আগের দিনগুলোর মতো - অর্থাৎ নতুন ইমেগ্রেন্ট হিসাবে আসার পর যেভাবে জীবন যাপন করতাম সেরকম ভাবে বাস স্টেন্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষার পালা। টরন্টোর পাবলিক ট্রানপোর্টের মধ্যে আছে বাস (যা সময়ানুবর্তিতার জন্যে তেমন ভাল সুনাম নেই), স্ট্রিট কার (যা দেখতে অনেকটা ট্রামের মতো, তবে চলার ভঙ্গী আর গতি বাংলাদেশের গরু গাড়ীর আমেজ এনে দেয়) আর সাবওয়ে ট্রেন (যা চমৎকার, আর সত্যই আধুনিক)। কর্মস্থলে ভ্রমনের জন্যে একবার বাস, তারপর সাবওয়ে এবং পরে আবার বাস মিলিয়ে পৌঁছতে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় লেগে যায়, যেখানে গাড়ী চালালে লাগতো ১০/১২ মিনিট। মনোঃকষ্ট নিয়ে প্রথম দিন যাবার পর দেখলাম - আরে, এতো বিরাট মজা। আমাকে রাস্তা দেখতে হচ্ছে না, ট্রাফিক লাইট দেখতে দেখতে হচ্ছে না, পথচারী পারাপারে কোন সিনিয়র সিটিজেন আছে কিনা সে বিষয় নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না, অন্য একজন আমার কাজগুলো করে দিচ্ছে - এদিকে আমি মজা করে একটা বই নিয়ে বসে আছি। ভালই হলো। এ সুযোগে ঘড়ির কাটার সাথে পাল্লা দেওয়া জীবনের মধ্যেও একটু পড়ার সুযোগ পাব, এ আনন্দে ঠিক করেছি সহজে গাড়ীর কথা মুখে আনবো না।

এ যাবৎ সাম্প্রতিক পড়া বই দুইটার বিষয়ে কিছু কথা বলার জন্যেই উপরের বিষয়ের অবতারনা। প্রথম বইটা হচ্ছে ত্রিশ বৎসর পর পুর্নাঙ্গ প্রকাশিত একটা দলিল - মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষ্য - হুমায়ন কবীর অনুলিখিত "ভারত স্বাধীন হল"। বিশেষ কারনে বইটির কিছু অংশ ত্রিশ বৎসর প্রকাশ করা হয়নি। আবুল কালাম আজাদ ছিলেন ইংরেজ শাসিত ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের দীর্ঘ সময়ের জন্যে সভাপতি। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন আগ্রগামী সৈনিক এবং আধুনিক ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা। ভারতের স্বাধীনতা, পাকিস্থানের জন্ম আর হিন্দু-মুসলিমদঙ্গা সহ সে সময়ে এক জীবন্ত ছবি এই বইটা। রাজনৈতিক নেতাদের হ্রস দৃষ্টি - ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া আর পরস্পরের মধ্যে বিভেদের কারনে যে ভাবে ভারত ভাগ হলো তার একটা প্রামান্য দলিল এই বইটি। ভারত ভাগের বিষয়ে মুসলিম লীগ সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ছিল - পরে কংগ্রেসের একটা অংশ এতে যোগ দেয়। তাদের সবাই জানত এবং তৈরী ছিল একটা বিভৎস এবং ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার জন্যে। এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লবভাই প্যাটেল এক দিকের বিবেচনায় দাঙ্গার ইন্দন যুগিয়েছে - এই বিষয়টা প্রথম বলা হয় এই বইএ। গান্ধীজী বল্লভভাইএর কর্মকান্ডের প্রতিবাদে অনশন করায় কিছু মুসলমানের জীবন রক্ষা পেলেও নিজের জীবন দিতে হলো এই চক্রের হাতে। বইটা পড়ে ভারতের সেকুল্যার পার্টি কংগ্রেসের ভিতরকার মৌলবাদী অংশটাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছি মৌলানা আজাদের দুরদর্শীতা দেখে। পাকিস্থানের দু'অংশের জন্ম সম্পর্কে তিনি বলেন -*"...কেহ এ আশা করে না যে, পুর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সমস্ত বৈষম্য ভুলে এক জাতিতে পরিনত হবে।"* অর্ধ শতাব্দী আগে যখন একজন মানুষ বাংলাদেশের জন্মের আভাস দেখতে পান - তাকে কি শ্রদ্ধা না জানানোর কোন কারন থাকতে পারে।

(২)

২য় লেখাটা জনকন্ঠ ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত একটা উপন্যাস - এইটা নিয়ে কিছু বলা দরকার মনে করছি। কারন লেখাটা পড়ে একটা সমস্যায় পড়ে গিয়েছি। আগে উপন্যাসটা সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া ভাল হবে মনে হয়। ক্যানাডা প্রবাসী লেখক সালমা বানী টরন্টোর বাঙালীদের জীবন, বিশেষ করে ইমিগ্রশনের আশায় বসে থাকা এক যুবকের মনের অবস্থা বর্ননার মধ্য দিয়ে সেখানকার বাঙালি সমাজের একটা খন্ড চিত্র তুলে ধরেছেন তার *"ইমিগ্রেশন"* নামের উপন্যাসে। তিনি তার উপন্যাসে টরন্টোয় বসবাসকারী বাঙালী সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাবলীর ছায়া অবলম্বন করে উপন্যাসের গল্পগুলো সাজিয়েছেন। যেমন - ১৯৯৭ সালে এক যুবক সাব-ওয়ের ট্রেনে কাঁটা পড়ে মারা যায়। এ নিয়ে সেই সময় অনেক কাহিনী শুনা গিয়েছে। তখন টরন্টো থেকে প্রকাশিত একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশে-বিদেশে' য় আসেফ মনসুর এই মৃত্যুর বিষয়ে বিরাট লেখা লিখেছিলেন। যা কিছুটা ছিল 'ফ্যাকট' আর বেশীর ভাগ 'ফিকশান'। কারো পক্ষে প্রকৃত সত্য জানা সম্ভব হয়নি - কারন যে মেয়েটার সাথে ছেলেটার সম্পর্ক ছিল সে বা তাদের পরিবার কোন দিনই এই বিষয়ে মুখ খুলেননি। অবশেষে পুলিশ সেটাকে একটা আত্নহত্যার কেস হিসাবে ঘোষনা করে। যাই

হোক, যে ছেলেটি এ করুন ঘটনার শিকার – সে ছিল বাঙলাদেশের এক সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষ – অবশ্যই মুসলমান না। লেখক সালমা বানী তার লেখায় ছেলেটাকে মুসলমান বানিয়েছেন। হয়তো সেটা গল্পের খাতিরই করেছেন। যা লেখকরা অহরহ করেন – এ নিয়ে তেমন সমস্যা হওয়ার কথাও না –সমস্যাটা হচ্ছে তিনি এর সাথে অন্য একটা অনুসঙ্গা যোগ করেছেন – যেখানেই আমি পাঠক হিসাবে একটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাই।আসুন পাঠক, উপন্যাসের সেই অংশটুকু দেখি যা আমাকে গভীর একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলেছে। লেখক লিখছেন – *"তার মৃত্যু সংবাদ বাংলা পত্রিকা সমুহে ছোট আকারে প্রকাশিত হলেও 'আমরা গর্বিত বাঙালি সাংস্কৃতিক ফোরামের' পক্ষ থেকে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। এবং এই নিহত যুবকের আত্নার মাগফেরাত সন্মিলিত বাংলাদেশী সংগঠনের পক্ষ থেকে ভিক্টোরিয়াস্থ বায়তুল মোকাদ্দেস মসজিদের নিকট গায়েবানা জানাজার প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে বায়তুল মোদাদ্দেস মসজিদের খতিব আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুসা বিন ইবনে বেলাল ফতোয়া দিয়ে জানায় আত্নঘাতীর জানাজা ইসলামে নিষিদ্ধ।"*

এখানে উল্লেখ্য যে, ভিক্টোরিয়া নামে কোন স্থান টরন্টোতে নেই, সেখানে বাইতুল মোকাদ্দেস নামে কোন মসজিদ থাকার কথা নয় – আর যে সময়কালের ঘটনার আশ্রয়ে এই গল্প সেই সময় বাঙালী পাড়ায় কোন মসজিদ ছিল না – অনেক পরে বাঙালী পাড়ায় বায়তুল মোকাররম নামে একটা মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। আর কোথাও জানাজার বিষয়ে এই ধরনে ফতোয়া দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ।

আগ্রহ নিয়ে একটা উপন্যাস পড়ার পর যদি পাঠককে উপন্যাসের বা ঔপন্যাসিকের ইথিকস্ নিয়ে ভাবতে হয় –সেটা যেমন পাঠকের জন্যে সুখকর নয় –লেখকের জন্যেও নয়। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে লেখক এই অংশটুকু যথাযথ ভাবে পাঞ্চ করতে সমর্থ হননি। প্রথমতঃ তিনি একটু সতর্ক হলেই প্রকৃত ঘটনা জেনে নিতে পারতেন এবং ইমিগ্রেশনে বৈধতা পেতে ব্যর্থ এক যুবকের করুন পরিনতি হিসাবে দেখাতে পারতেন এবং সেটাই বরঞ্চ বেশী প্রাসংগিক হতো – কমপক্ষে উপন্যাসের মুলস্রোতের সাথে একাত্ব হতো এই ঘটনাটা। তা না করে – একটা বিয়োগান্তক সত্য ঘটনা বর্ননা করার আড়ালে একটা সম্প্রদায়ের ধর্ম এবং তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির সম্পর্কে একটা কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী তৈরী করেছেন – যা সহজেই পাঠকদের মধ্যে সে সম্প্রদায় সম্পর্কে একটা বিরুপ ধারনা দেবে। এক কথায় বর্তমানে বাজারের চালু ইসলাম বিদ্বেষের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তার জন্যে লেখক এ ধরনের একটা করুন ঘটনার বিবরনের ফাঁকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে নিজস্ব মতবাদ প্রতিফলনের লক্ষ্যে সম্পুর্ন একটা সাজানো ঘটনার মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়কে একটা বিশেষ একটা রুপ দিয়েছেন। এখানেই একজন পাঠক হিসাবে আমার কিছু প্রশ্ন এসে যায়ঃ

১) লেখক, সাহিত্যিক বা সংস্কৃতিক কর্মীদের বলা হয় সমাজের অগ্রগামী সৈনিক। যাদের লেখা পড়ে – গান শুনে – প্রবন্ধ পড়ে – বক্তৃতা শুনে সাধারন মানুষ অনুপ্রানিত হবে। যারা মানুষকে অন্ধকার আর আলোর তফাৎ বুঝাবে, মানুষকে দেখাবে সত্য আর মিথ্যার সুস্পষ্ট সীমারেখা। তারা যখন সত্য আর মিথ্যাকে এক করে পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন – তখন কি সে লেখক তার উপর আর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন না?

২) একজন প্রাবন্ধিক যখন তার লেখার সত্যতা প্রমান করতে বাধ্য – তখন সত্য ঘটনার আশ্রয় নিয়ে উপন্যাস লেখকরা কি সত্য আর মিথ্যার কোন সীমারেখা মানতে বাধ্য কিনা?

৩) পাঠক যখন রুপকথা বা কল্পকাহিনী পড়েন – তখন নিশ্চিত জানেন যে এর মধ্যে যা আছে সবই মিথ্যা – কিন্তু যখন উপন্যাসের স্থান – কাল – পাত্র সবই সত্য হয় কিন্তু অংশবিশেষ সম্পুর্ন কল্পনাশ্রয় করে উদ্দেশ্যমুলক ভাবে লেখা হয় সেটা পাঠকদের সাথে প্রতারনা করা হয় কিনা?

উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে যদি কোন সাহিত্যিক বা লেখক এগিয়ে আসেন তাহলে বাধিত হবো– নতুবা সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বের মধ্যেই হয়তো বাকী জীবন কাটাতে হবে। আমার মতে সাহিত্য বিবেচনায় সালমা বানী ইচ্ছা করলেই এই একটা প্যারাগ্রাফ এড়িয়ে তার উপন্যাসটাকে আরো বাস্তব এবং আকর্ষনীয় করে তুলতে পারতেন। তারপরও তার লেখা উপন্যাস একজন পাঠক হিসাবে আমাকে যে পরিমানে আনন্দ দিয়েছে – তার জন্যে তাকে ধন্যবাদ।

এ বিষয়টি নিয়ে একজন নামকরা ঔপন্যাসিকের সাথে কথা হলো। তিনি বললেন যে, এখানে লেখক ঠিকই আছেন। তাঁর মতে তাদের লেখার বিষয়ে লেখকরা স্বাধীন । মজার বিষয় হলো কিছু দিন আগে তাঁর সাথে কথা হয়েছিল হুমায়ুন আহমেদের "জোৎস্না ও জননীর গল্প" নামের উপন্যাস নিয়ে। তিনি হুমায়ুন আহমেদের উপর রেগেমেগে তাকে

মোটামুটি রাজাকারের দোসর বানিয়ে ছেড়েছেন। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে যখন বললাম – “যেহেতু আপনি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাটা জানেন তাই রেগে গিয়েছিলেন। একইভাবে টরন্টোর একটা ছেলে আত্মহত্যা করেছে বিশেষ কারনে যা আমরা জানিনা – সে করুন ঘটনাটাকে যখন কেহ নিজের মনের ঘৃনা প্রকাশের নিমিত্তে ব্যবহার করেন– সেটাও কি মিথ্যাচার হবে না – সেটাও কি ইতিহাস বিকৃতি হবে না?” তিনি এরপর আমার সাথে একমত হলেন এই কথায় – “সবার মতো লেখকদেরও সততা থাকা দরকার।”

(৩)

দীর্ঘদিন পর মোস্তফা কামালে লেখা পড়লাম। ভাই, মহা চীনও কম যায় না। ব্যবসা আর লাভ ছাড়া তারাও কোন সম্পর্ক রাখবে না। আর বাংলাদেশটাকে যদি ১৯৭১ সাল থেকে হিসাব করেন তবে অবশ্যই চীনের ভূমিকার কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আর যদি ১৯৪৭ সাল থেকে হিসাব করেন তবে সেটা আলাদা। সাধারন মানুষ হিসাবে ভেবে দেখুন – ১৯৭১ সালে ভারত যদি তার বর্ডারটা বন্ধ রাখতো তাহলে হয়তো আপনার আর আমার চেহারাটা অন্যরকম হতো, সেটা কি স্বীকার করেন? পাকি ভাইদের বন্দুকের খোরাক হওয়া ছাড়াও – তাদের পাক্কা মুসলমান তৈরীর প্রজেক্টের ফলে হয়তো আমাদের অনেক মা-বোন তাদের জীবন হারাতো বা সম্ভ্রম হারাতো। উপকারীর উপকার স্বীকার কথা মহত্ব আর তার ভিতরের স্বার্থ খুজঁতে যাওয়া হীনমন্যতা। এই কথার থেকে একটুও ভুল বুঝবেন না যে – আমি কোন দিন্ই ভারতে বলবো বাংলাদেশের বন্ধু – না ছিল অতীতে বা হবে ভবিষ্যতে। ভারত ঐ অঞ্চলের একটা পরাশক্তি আর বাংলাদেশ তার জন্মাবধি সেই পরাশক্তির লাভের আর লোভের বলি। যাই হোক – কথা হচ্ছিল জেনারেল আরোরা মারা গেলে বাংলাদেশের সরকার শোক প্রকাশ করেন নি সে বিষয়ে– তর্কের খাতিরে বলতে গেলে বলতে হয় – এটা কোন দোষের কিছুই না। কারন জেনারেল আরোরা কোন রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করেন না যার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কূটনৈতিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। তবে সমস্যাটা তখনই আসে যখন মানুষ এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্যমূলক কিছু দেখা যায়। আপনার মনে আছে কিনা – গতবারে (১৯৯১ – ৯৬) ক্ষমতাশীন বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ওয়াহিদের মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় ভাবে শোক বার্তা পাঠিয়েছিলন। একজন শত্রুপক্ষের জেনারেলের মৃত্যু শোক প্রকাশ করে মিত্রপক্ষের জেনারেলের বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করাটা স্বাভাবিক ভাবে কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়।

আর একটা কথা বলি জনাব কামাল সাহেব – যে রাজাকার প্রধান ক্ষমতায় বসে বাংলাদেশ সরকারের কলকাঠি নাড়ছে তাদেরই বেশী কৃতজ্ঞ থাকার কথা ভারতীয় জেনারেলের কাছে। যদি স্বাধীনতার পর সেই জেনারেলের বাহিনী শক্ত হাতে হাল না ধরতো তবে হয়তো জামাতে ফ্লাগটা ধরার মতও একটা রাজাকার অবশিষ্ট থাকতো কিনা সন্দেহ। যেখানে জেনারেল ওয়াহিদের বাহিনী যুদ্ধের আর মানবতার নিয়মকানুন অবজ্ঞা করে নির্বিচারে বাঙালী নিধন আর মেয়েদের ধর্ষন করছিল তখন আরেক জেনারেল অরোরার বাহিনী তাদের আর তাদের দোসরদের জেনেভা কনভেনশনের অধীনে রক্ষা করে যে প্রফেশন্যালিজমের দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন তার কথা মনে করে কি তার জন্যে একটা লাইনের শোক প্রকাশ মহত্বের কাজ হতো না। যেখানে একটা দেশের সরকার গনহত্যার নেতৃত্ব দানকারী সেনাপতির মৃত্যুতে শোকাভিভুত হয় আর মানবতার পক্ষে কাজ করা আরেকজন জেনারেলের জন্যে তাদের উদ্দেশ্যমুলক উপেক্ষা কি জাতি হিসাবে বাংলাদেশীকে নত মস্তক করে না? তবে রাজাকার চালিত সরকারের থেকে এর বেশী আশা করা হবে একটা বোকামী। আরো একটা কথা বলি– আপনার কি মনে হয় না – রাজাকার আর দালালদের সবসময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ শেখ মুজিবুর রহমানে নামে – যা মহানুভবতায় তারা বেঁচে গেছে বলে আজ ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারছে। দুঃভাগ্য তাদের, তারা তাদের উপকারীদের কাছেতো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেইনা, বরঞ্চ উপকারীর সর্বনাশ করার চিন্তা তাদের মনে সবসময় কাজ করে। তাদের কোন কর্মকান্ডের পক্ষে একটা কথা বলাও একটা জঘন্য কাজ হবে মনে করি।

(৪)

ব্রিটেনের নির্বাচন হয়ে গেল। এটার দিকে লক্ষ্য রেখেছে বিশ্বের সব সচেতন মানুষ। দেখার বিষয় ছিল – বিশ্বের আদিমতম গনতন্ত্রের দেশের মানুষ কিভাবে তাদের নেতা র্নিবাচন করেন। তারা একজন মিথ্যাবাদী ও যুদ্ধাপরাধী নেতাকে পুনঃনির্বাচন করেন – নাকি তার বিকল্প একজন কট্টর নেতাকে বেছে নেন। ফলাফল হয়েছে মিশ্র। এতে সবাই বিজয়ী হয়েছে। টোরিরা আসন বাড়ায় খুশী, বামপন্থীরাও তথাস্তু। আর টনি ব্লেয়ার নির্বাচিত হয়ে দু’টা রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। প্রথমটা হলো একজন লেবার নেতা হিসাবে পর পর তিনবার নির্বাচিত হওয়া এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে

ইতিহাসের সর্বনিম্ন ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করা। লেবার পার্টি ভোট পেয়েছে ৩৫% এবং ভোটারদের মধ্যে ভোট দিয়েছে ৬১.৩%। এই হিসাবে ব্রিটেনের নির্বাচকদের ২১.৪% লেবার পার্টিকে ক্ষমতায় দেখতে চেয়েছেন বলা যায়। বাকী তিন চর্তুথাংশ মানুষ ব্লেয়ারকে চায় না। তরপরও তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে থাকবেন আরো পাচঁ বৎসর। শুভংকরের ফাঁকির মতো গনতন্ত্রের এই বিরাট ফাঁপা অংশটা বন্ধ করার মতো চিন্তা কেহ করছে কি? ক্যানাডার বৃটিশ কলোম্বিয়া প্রদেশে এবারের নির্বাচনের ব্যালটের সাথে একটা গনভোটের ব্যালট দেওয়া হবে। যাতে অংশীদারিত্বের পার্লামেন্টের বিধানের পক্ষে মতামত দানের সুযোগ দেয়া হবে। যদি গনভোটে এই বিষয়টা অনুমোদিত হয় - তবে আগামী নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে পার্লামেন্টে আসন বন্টন হবে এবং সেখান থেকে সরকার গঠন করা হবে। মোট কথা গনতন্ত্রের ভোট এবং আসনের ব্লাকহোলটা বন্ধ করার একটা যুগান্তকারী সমাধান হবে সেখান। যা হোক - টনি ব্লেয়ারের বিজয় বুশ সাহেবের মতো এত মসৃন হয়নি আর তার আগামী দিনগুলোকে কঠিন করার জন্যে নব নির্বাচিত এম পি জর্জ গ্যালওয়েই যথেষ্ট। একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় - বৃটেনে বামদের আসন বেড়ে ৬২ হওয়াটাকি বামপন্থার নব উত্থান হিসাবে দেখা হবে?

(৫)

একটা কথা বলেই শেষ করবো। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে জামাত ঠেকানোর নামে কিছু লোক কিছু প্রবাসে সংগঠন আর প্রচার চালাচ্ছে। বাংলাদেশে কি জামাত এত ক্ষমতাধর যে সেখানে জামাত বিরোধীতা করা সম্ভব নয়? একটা বিষয় লক্ষ্যনীয়, তাদের জামাত বিরোধীতা যে শুধু মাত্র জামাত বিরোধীতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে তা নয়। জামাত আর ইসলামকে এক করে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি করছে। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার জামাত শুধু মাত্র বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক দল। যারা ইসলামের কথা বলে ক্ষমতায় যেতে চায়। না তারা ইসলামী বিপ্লব করবে - না ধমীয় বিশ্বাসের পক্ষে দৃঢ় ভাবে থাকবে। সর্বশেষ বক্তব্যে নিজামী সাহেব তাই বলেন - ১৯৭৮ সাল থেকে বলছেন ইসলামের কথা - এখন বলছেন আওয়ামীলীগ ঠেকানোর জন্যে তারা ক্ষমতার মসনদের একটা ভাগ নিয়েছেন। যদি আওয়ামীলীগ ঠেকানো আর ইসলামী শাসন কায়েম এক কথা হয় - তবে ধরে নিতে হবে ৪১% ভাগ মানুষ - যারা আওয়ামীলীগকে ভোট দেয় তারা ইসলাম বিরোধী। আসলে কি তাই। তারা কিন্তু ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনতে পাঁচ বৎসর জানপ্রান দিয়ে কাজ করেছে । একবার বলছে মহিলা নেতৃত্ব হারাম - আবার মহিলাদের নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছে। যাদের কোন স্থায়ী রূপ নেই - কথা আর কাজে তারা বিরাট গড়মিল তৈরী করেন। তারা অনেক কাজ করেন এবং অনেক কথা বলেন, যা ইসলামের নীতি - আদর্শের সাথে মিলে না। সুতরাং জামাতে ইসলামীকে বাংলাদেশের ইসলামের সোল এজেন্ট ভাবা বিরাট ভুল হবে। এ অবস্থায় জামাত বিরোধীতার নামে যারা ইসলাম ধর্মকে হেয় করতে চায় তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। পরিষ্কার কথা, জামাত বিরোধী শুধু মাত্র রাজনৈতিক ভাবে করা যেতে পারে। উদাহরন হিসাবে বলা যায়, জামাতে মতিউর রহমান নিজামী একজন চিহ্নিত রাজাকার - এবং তিনি আওয়ামী লীগের এক বড় নেতাকে পরাজিত করে এম পি হয়েছেন। যদি আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয় সেখানে আপনি কাকে ভোট দিতেন। আমার উত্তর হবে ভোট দিতে যাবে না। কারন - মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মানুষ আওয়ামী নেতাকে ভোট দেয়ার অর্থ বর্তমানকে অস্বীকার করা আর নিজামীকে ভোট দেওয়ার অর্থ অতীতকে অস্বীকার করা। কাজটা সেখানেই করা যেতে পারে- বাংলাদেশের রাজনীতিকে মাফিয়ামুক্ত করলেই মানুষ তখন আসল সত্যটাকে গ্রহন করতে পারবে। নতুবা দু'য়ের তুলনায় আর বিপক্ষে ভোটের মাধ্যমে শুধু জামাতই না - যে কেহ ক্ষমতায় যেতে পারবে। এ নিয়ে বিদেশে বসে সংগঠন করে কোন কাজ হবে বলে আমি অন্তত্ব বিশ্বাস করতে পারি না।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম জিয়াউদ্দিন
টরন্টো
মে, ০৬, ২০০৫